৩। সূরা আর-রাদ ২য় রুকু(৮-১৮ আয়াত)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ؕ وَ كُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ ১৩ : ৮
بِمِقْدَارٍ

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তার নিকট প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রুণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আলেমুল গায়েব। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ ؕ وَ مَا ৩১ : ৩৪
تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَ مَا تَدْرِیْ نَفْسٌۢ بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না। আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[সূরা লোকমানঃ ৩৪]

আমরা যদি সূরা লোকমান এর এ আয়াতটির সাথে আলোচ্যসূরার (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ) আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে তাফসীর করি তাহলে বর্তমান কালের এ আয়াত সংক্রান্ত অনেক সন্দেহের জবাব দেয়া সহজ হয়ে যাবে। কারণ সূরা লোকমানের আয়াতে যা বলা হয়েছে এ আয়াত তার তাফসীর হতে পারে।

মাতৃগর্ভে কি আছে? বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে, তা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু মাতৃগর্ভের এই বাচ্চা সৎ না অসৎ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, পূর্ণ না অপূর্ণ, বিকলাঙ্গ না অবিকলাঙ্গ, সুশ্রী না কুশ্রী হবে ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

গর্ভাশয়ে অবস্থিত সন্তানের অবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেলেও তা সূরা লোকমান এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি গায়েব এর জ্ঞানের দাবী কেউ করতে পারবে না। বিশেষ করে সহীহ হাদীসে গায়েবের পাঁচটি বস্তু বর্ণনায় যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাও এ তাফসীর সমর্থন করছে। হাদীসে এসেছে, গায়বের চাবি হল পাঁচটি। কিয়ামত কখন ঘটবে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে, মায়ের গর্ভাশয়ে কি বাচ্চা আছে, কাল কি ঘটবে এবং মৃত্যু কখন আসবে? এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। (বুখারীঃ তাফসীর সূরা আনআম) [বুখারীঃ ৪৬৯৭]
আল্লাহ ইরশাদ করেছেন--

আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। সূরা আন'আমঃ ৫৯

আর এটা সর্বজনবিদিত যে, গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বা হবে তা কেউ কোন দিন বলে দিতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। [সূরা আন-নাজম: ৩২]

আরও বলেন, “তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।” [সূরা আলে ইমরান: ৬] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই জানেন কোন মহিলা কোন ধরণের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে। তখন ما টি হবে موصولة [আদওয়াউল বায়ান]

কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ “প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছেই রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে নাযিল করি।” [সূরা আল-হিজর: ২১]

আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"সূরা আশ্-শূরা ৪৯

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٩ : ١٣

৯. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।

আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الْكَبِيرُ শব্দের অর্থ বড় এবং الْمُتَعَال-এর অর্থ উচ্চ তিনি মান মর্যাদার দিক থেকে যেমন সবার উপরে, ক্ষমতার দিক থেকেও সবার উপরে। অনুরূপভাবে তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সবার উপরে। [ইবনুল কাইয়েম, মাদারিজুস সালেকীন: ১/৫৫] উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সবার চেয়ে বড়, তিনি সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্বে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি-দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তার জন্যএমন সবগুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তার মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। তিনি সেগুলো থেকে অনেক উর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর]

উদাহরণতঃ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আরবের মুশরিকগণ আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআনুল কারীম তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছেঃ (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র-মহান! [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১] -অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র যেগুলো তারা বর্ণনা করে। প্রথম (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) এবং তৎপূর্ববর্তী (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ) বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় (الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) বাক্যে শক্তি ও মাহাত্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, "আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যারোপ করে অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। আর আমাকে গালি দেয়, এটাও তার জন্য উচিত নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে, সে বলে আমাকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কোনভাবেই কঠিন নয়। আর আমাকে গালি দেয়ার ব্যাপারটি হলো, সে বলে আল্লাহ সন্তান গ্ৰহণ করেছেন। অথচ আমি একক, সামাদ, জন্মগ্রহণ করিনি এবং কাউকে জন্মও দেইনি। আর কেউই আমার সমকক্ষ নেই।" [বুখারী: ৪৯৭৪]

১৩ : ১০ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহর নিকট সমান।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।” [সূরা আল-মুলকঃ ১৩–১৪]

আরো বলেছেনঃ “যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।” [সূরা ত্বা-হাঃ ৭]

অন্য আয়াতে বলেছেনঃ “এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর আর যা প্রকাশ কর।” [সূরা আন-নামলঃ ২৫]

অন্যত্র বলেছেনঃ “সাবধান! নিশ্চয়ই ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তা সবিশেষ অবহিত [সূরা হুদঃ ৫]

আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। সূরা ইউনুসঃ ৬

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তার শক্তি সমভাবে পরিব্যপ্ত। কেউ তার ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا ১৩ : ১১
بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ
دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ

১১. আর মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

শব্দটি معقبة এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبة অথবা متعقبة বলা হয়। (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। (مِنْ خَلْفِهِ) এর অর্থ পশ্চাদিক। আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে।

এক. তারা আল্লাহর নির্দেশের কারণে তাকে হেফাযত করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘুরাফেরা করে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। রাতে তাদের থেকে হেফাযত করে।

যেমন আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা তার ভাল কিংবা মন্দ আমল হেফাযত করে। রাতে কিছু ফেরেশতা দিনে কিছু ফেরেশতা। তার ডানে বামে দুজন, যারা তার আমল লিখে। ডান দিকের ফেরেশতা তার সৎকর্ম লিখে, আর বাম দিকের ফেরেশতা তার অসৎকর্ম লিখে। আবার দুজন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাকে হেফাযত করে, একজন তার সামনের দিকে অপরজন তার পিছনের দিকে। সুতরাং সে দিনে রাতে চার ফেরেশতার মাঝখানে বসবাস করে। যারা পরিবর্তিতভাবে আগমন করে থাকে। দু'জন আমল হেফাযতকারী আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। আর বাকী দু'জন লিখক। তাদের আমলনামা লিখে। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছেঃ ফিরিশতাদের দুটি দল হেফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতের সময় একত্রিত হন। ফজরের সালাতের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের সালাতের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফিরিশতারা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। [বুখারীঃ ৭৪২৯, মুসলিমঃ ৬৩২]

দুই. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ থেকে তাকে হেফাযত করে [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তার কোন প্রকার আযাব যেমন, জিন ইত্যাদি থেকে তাদেরকে হেফাযত করে। [কুরতুবী] তারপর যখন তার তাকদীর অনুসারে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসে তখন ফিরিশতাগণ সরে পড়ে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ ‘প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফিরিশতাগণ তার হেফাযত করেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ তবে কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশতারা সেখান থেকে সরে যায়। [ইবনে হাজারঃ ফাতহুল বারী ৮/৩৭২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন ফিরিশতা এবং একজন শয়তান জুড়ে দেয়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার সাথেও? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সহযোগিতা করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পন করেছে, বা আমি নিরাপদ হয়ে গেছি, সে আমাকে ভাল কাজ ছাড়া আর কোন কিছুর নির্দেশ দেয় না। [মুসলিমঃ ২৮১৪]। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফিরিশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকের বিপদাপদ থেকেই মানুষকে নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। [ইবন কাসীর]

উত্তরঃ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দিক থেকে ফেরেশতাগণ কয়েকভাবে বিভক্ত। (১) ফেরেশতাদের কেউ রাসূলদের নিকট অহী নিয়ে আসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন রূহুল আমীন জিবরীল (আঃ)।

(২) কেউ বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন মীকাঈল (আঃ)।

(৩) কেউ শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত। যেমন ইসরাফীল (আঃ)।

(৪) কেউ আবার রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হলেন মালাকুল মাওত ও তাঁর সাথীগণ।

(৫) কোন কোন ফেরেশতা বান্দার আমলসমূহ লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁরা হলেন কিরামুন কাতিবুন।

(৬) তাদের কেউ বান্দাকে তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা হলেন পরপর আগমণকারী ফেরেশতাগণ।

(৭) তাদের কেউ জান্নাত ও তার নেয়ামতের দায়িত্বে নিয়োজিত। যেমন রিযওয়ান ফেরেশতা ও তাঁর সাথীগণ।

(৮) তাদের কেউ জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত। তিনি হলেন মালেক এবং দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। তাদের নের্তৃস্থানীয়দের সংখ্যা উনিশজন।

(৯) তাদের কেউ কেউ কবরের আযাবের দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা হলেন মুনকার ও নাকীর।

(১০) তাদের কেউ আল্লাহর আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

(১১) তাদের কাউকে 'কারুবীয়ূন' বলা হয়। তাঁরা আল্লাহর আরশের চারপাশে সদা তাসবীহ পাঠের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

(১২) তাদের কেউ মার্তৃগর্ভে রূহ ফুৎকার, মার্তৃগর্ভে মানব দেহ গঠন এবং তাতে যা লিখতে বলা হয় তা লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত।

(১৩) তাদের কেউ কেউ বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করেন। তাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। যারা একবার প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার আর তারা তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না।

(১৪) কিছু ফেরেশতা এমন আছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং যিকিরের মজলিস খুঁজে বেড়ায়।

(১৫) অগণিত ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা কখনও ক্লান্তি বোধ করে না।

(১৬) আরো এমন ফেরেশতা আছেন, যারা রুকূ ও সিজদায় পড়ে আছে। তারা কখনও মাথা উত্তোলন করে না।

উল্লেখিত ফেরেশতাগণ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফেরেশতা আছে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

''আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো (জাহান্নামের বর্ণনা) মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু নয়''। (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৩১) ফেরেশতাদের প্রকারভেদ এবং তাদের কাজ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাতে আরো অগণিত দলীল রয়েছে।

---- "আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তন করে না নেয়।" [বাগভী] তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয়

কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। এ পরিবর্তন হয় তারা নিজেরা করে, অথবা তাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তারা করে, নতুবা তাদেরই মধ্যকার অন্যদের কারণে সেটা সংঘটিত হয়। যেমন উহুদের মাঠে তীরন্দাযদের স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের উপর বিপদ এসে পড়েছিল।

ইসলামী শরীআতে এরকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও কোন গুনাহ ব্যতীত তাদের উপর বিপর্যয় দেন না। বরং কখন কখনও অপরের গুনাহের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমাদের মধ্যে নেককাররা থাকা অবস্থায় কি আমাদের ধ্বংস করা হবে? তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, যখন অন্যায় অপরাধ ও পঙ্কিলতা বৃদ্ধি পায়। [বুখারী ৩৩৪৬; মুসলিম: ২৮৮০]

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তার আনুগত্য ত্যাগ করে পাপাচার, ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন: [সূরা আল আনফালঃ ৫৩]

বলাবাহুল্য, যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আঘাত দিতে চান, বিপদে ফেলতে চান, অসুখ দিতে চান, রোগাক্রান্ত করতে চান, তখন কেউ তার সে বিপদ ফেরাতে পারে না [কুরতুবী] আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থেও কেউ এগিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং তোমরা এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববতী-পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তার শাস্তি রদ করা হয় না।” [আল-আনআমঃ ১৪৭] আরো বলেছেন অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি রদ করা যায় না [সূরা ইউসুফঃ ১১০]

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ১৩ : ১২

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা-আকাংখারূপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ

আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করান। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভষ্ম করে দেয়। আবার এটা আশার সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। [বাগভী] আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে মুসাফিরের জন্য কষ্টের ভয় এবং মুকীম বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর জন্য আশার বৃষ্টি ও রহমতের কারণ বলা হয়েছে।[ইবন কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ ১৩ : ১৩
يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

১৩. আর রা'দ তার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাগণও তা-ই করে তার ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান অতঃপর যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, আর তিনি শক্তিতে প্রবল শাস্তিতে কঠোর।

রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তার ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। মুজাহিদ বলেন, রা'দ বলে যদি মেঘের গর্জন বুঝা হয়, তবে এ তাসবীহ পাঠ করার অর্থ হবে আল্লাহ তাতে জীবন সৃষ্টি করেন। [কুরতুবী] অথবা এটা ঐ তাসবীহ যা কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, “সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।” [সূরা আল-ইসরাঃ ৪৪] [ইবন কাসীর]

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ফিরিশতার নাম রা'দ। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩১১৭] এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মাহিমান্বিত প্রকাশে ফেরেশতাদের প্রকম্পিত হওয়া এবং তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসা গীতি গাইতে থাকার কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে ফেরেশতাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করে এসেছে এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক মনে করে এসেছে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে শরীক নয় বরং তারা তার অনুগত সেবক মাত্র এবং প্রভুর কর্তৃত্ব মহিমায় প্রকম্পিত হয়ে তারা তার প্রশংসা গীতি গাইছে।

হাদীসে এসেছে, এক প্রতাপশালী লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠালে সে লোক বললঃ কে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহ কি? সোনার না রূপার? নাকি পিতলের? এভাবে তিনবার সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো লোককে বলে পাঠাল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত করালেন। ফলে তার মাথা গুড়িয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবনে আবি আসেমঃ আস সুন্নাহঃ ৬৯২]

রয়্যাল আল বাইত ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক থট, জর্ডান থেকে প্রকাশিত তাফসির ইবন আব্বাসে এ আয়াত দু’টির তাফসিরে বলা হয়েছে যে—

“ (তিনিই[আল্লাহ] তোমাদেরকে দেখান বিজলী) - বৃষ্টি, তা পথিকের জন্য ভয়ের, কারণ এর ফলে তার জামাকাপড় ভিজে যাবে।এবং মুকিম বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর জন্য তা আশার, কারণ এর ফলে তার জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে।তিনিই ভারী মেঘমালাকে তৈরি করেন এবং উপরে উত্থিত করেন যা বৃষ্টিকে ধারণ করে।

(বজ্র ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে) – তাঁরই নির্দেশে; এ (বজ্র) হচ্ছে একজন ফেরেশতা।এও বলা হয়েছে যে, এ হচ্ছে আকাশের ধ্বনি (ফেরেশতাদেরও) এবং ফেরেশতারা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। এবং তিনি বজ্রপাত করেন – অর্থাৎ জ্বালিয়ে দিতে পারেন, এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা এ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন।এখানে যাইদ ইবন কায়েসের কথা বলা হচ্ছে যাকে আল্লাহ বজ্রপাত দিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। ...”

..একবার আমের বিন তুফাইল আমেরী এবং আরবাদ বিন রবীয়া আমেরী রাসুল(ﷺ) এর নিকট গেল। তারা রাসুল(ﷺ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আমের রাসুল(ﷺ)কে বলল, “আপনি একটু উঠুন, আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই।” আমের তার সাথী আরবাদকে আরো বলে রেখেছিল যে মুহাম্মাদ(ﷺ) যখন আমার সাথে আলাপে মগ্ন থাকবে, তখন তুমি অতর্কিতে পিছন থেকে তাকে তলোয়ারের আঘাত করে শেষ করে দেবে। আরবাদ সুযোগ বুঝে রাসুল(ﷺ) এর পেছনে চলে এল, কিন্তু খাপ থেকে কিছুতেই তলোয়ার বের করতে পারল না।বার বার চেষ্টা করেও বিফল হল। তখন অকস্মাৎ বজ্রপাত হল এবং বজ্র পড়ল পাপিষ্ঠ আরবাদের মাথার উপর। বজ্রাহত হয়ে সে নিমেষেই মারা গেল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল আমের কিন্তু পালাতে পালাতে সে বলছিল যে সে রণকুশলী লোকদের দিয়ে এই উপত্যকা ভরে ফেলবে [অর্থাৎ রাসুল(ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা]। পরদিন তার উরুর উপরে একটি বড় ফোঁড়া হয় এবং সে ঘোড়ার পিঠে মৃত্যুবুরণ করে। তাফসির মাজহারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০১

তাফসির ইবন কাসিরেও ইবন আব্বাস(রা) থেকে “এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন” এর শানে নুযুলে এই ঘটনাটি বর্ণিত আছে। তাফসির ইবন কাসির, ৪র্থ খণ্ড, সুরা রা’দের ১২-১৩ আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬২

মেঘের গর্জন একথা প্রকাশ করে যে, যে আল্লাহ এ বায়ু পরিচালিত করেছেন, বাষ্প উঠিয়েছেন, ঘন মেঘরাশিকে একত্র করেছেন, এ বিদ্যুৎকে বৃষ্টির মাধ্যম বা উপলক্ষ্য বানিয়েছেন এবং এভাবে পৃথিবীর জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন তিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি-অভাব মুক্ত, তিনি জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী। তাঁর গুণাবলী সকল প্রকার আবিলতা থেকে মুক্ত এবং নিজের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর কোন অংশীদার নেই। পশুর মতো নির্বোধ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা তো এ মেঘের মধ্যে শুধু গর্জনই শুনতে পায় কিন্তু বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সজাগ শ্রবণ শক্তির অধিকারীরা মেঘের গর্জনে তাওহীদের গুরুগম্ভীর বাণী শুনে থাকে।

--- এখানে محال শব্দটি মীমের নীচে كسرة বা যের যোগে। যার অর্থঃ কৌশল, শক্তিসামর্থ্য ইত্যাদি [বাগভী] শব্দটির বিভিন্ন অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা আল্লাহ তা’আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তা’আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। [মুয়াসসার] তার সামনে সবার চাতুরী অচল। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন দিক থেকে তার উপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হালকাভাবে আজেবাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে? তাঁর ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তিনি যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। [সা’দী] সুতরাং যদি তিনিই কেবল বান্দাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাদের জন্য রিযিকের মৌলিক ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই যদি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত বড় বড় সৃষ্টি যেগুলো বান্দাদের মনে ভীতির উদ্রেক করে এবং বিরক্তির সঞ্চার করে তারাও যদি তাঁকেই ভয় পায়, তবে তো তিনিই সবচেয়ে বেশী শক্তিমান। একমাত্র তিনি ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাই পরবর্তী আয়াতে তাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে। [সা’দী]

لَهٗ دَعۡوَةُ الۡحَقِّ ؕ وَ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ لَا يَسۡتَجِيۡبُوۡنَ لَهُمۡ بِشَيۡءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيۡهِ ১৪ :
اِلَى الۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِيۡ ضَلٰلٍ

১৪. সত্যের আহবান তারই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহবান করে, তাদেরকে কোন কিছুতেই তারা সাড়া দেয় না? তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এ আশায় তার

দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত।

ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে বিবেচিত। তাঁর আহবানই হক্ক আহবান। সে আহবানের মূল হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোন মা’বুদ নেই। (دَعْوَةُ الْحَقِّ) শব্দের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে। [দেখুন, তাবারী]

ۙ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ১৮৬ : ২
فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। সূরা বাকারাঃ ১৮৬

দু‘আ (الدعاء) অর্থ আহবান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। ডাকা বা আহবান করা এবং প্রার্থনা করা পরস্পর জড়িত। কারো কাছে প্রার্থন করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

দু‘আ বা প্রার্থনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু‘আকে অনেক সময় ‘ইসতি‘আনাহ (الاستعانة) অর্থাৎ ‘আওন’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিম্দাদ’ (الاستمداد), অর্থাৎ ‘মদদ’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ‘ইসতিগাসাহ’ (الاستغاثة) অর্থাৎ ‘গাউস’ বা ত্রাণ বা উদ্ধার প্রার্থনা ইত্যাদি বলা হয়। সবকিছুরই মূল ‘দু‘আ’।

প্রার্থনা করা বা ডাকার বিষয় বস্তুত দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য

সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক বা অপার্থিব। জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো ‘‘ধর্মের অনুসারী’’ বা ‘‘বিশ্বাসী’’ করেন। ‘‘বিশ্বাসী’’ কেবলমাত্র ‘আল্লাহ’, ‘ঈশ্বর’ বা সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে ‘ইশ্বরের’ বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে ‘ঐশ্বরিক’ ক্ষমতা আছে, তার কাছেই এরূপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন।

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনা বা ডাকাই ইবাদত-এর সার্বজনীন প্রকাশ। সকল যুগে সকল ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে অপার্থিব ও অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু‘আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। এভাবে আমরা দেখছি যে দু‘আই হলো ইবাদত-এর সর্বজনীন ও সর্বপ্রধান প্রকাশ। নু’মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, নবীজী (ﷺ) বলেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

‘দু‘আ বা প্রার্থনাই ইবাদত।’’ একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন: সূরা গাফির (মুমিন) : ৬০।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

‘তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১১; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৭৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৫৮; ইবনু হিববান, আস-সুনান ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৭। হাদীসটি সহীহ।

(২) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এর তাফসীরে বলেন, সে লোক মুখে পানির জন্য আহবান করছে আর পানির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এভাবে তো আর পানি কখনো মুখে পৌছে না। পানি পৌছার জন্য পানিকে আহবান না করে তা নিয়ে মুখে দিয়ে দিতে হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এটা হলো মুশরিকের উদাহরণ। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার উদাহরণ ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির মত যে তার মনে মনে পানির কথা ভেবে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে বসে আছে। সে পানি পাওয়ার শত আশা করলেও পানি পেতে পারে না। [তাবারী] তদ্রূপ মুশরিক ব্যক্তিও আল্লাহ ছাড়া অপর যাদেরকে ডাকে তাদের কাছে তার মনের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূরণের আশা করে বসে আছে। কিন্তু তার আশা তো এভাবে কখনো পূরণ হবার নয়। তাকে তা পূরণ করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই যেতে হবে।

وَ لِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ كَرۡهًا وَّ ظِلٰلُهُمۡ بِالۡغُدُوِّ وَ ১৩ : ১৫
(سُجود) ﴿الۡاٰصَالِ﴾ ١٥

১৫. আর আল্লাহর প্রতিই সিজদাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়।

তেলাওয়াতের সিজদাঃ সুন্নাত(যদিও অনেকে বলেছেন ওয়াজিব)

আলেমদের দুটো অভিমতের মধ্যে সঠিক মতানুযায়ী তেলাওয়াতের সিজদার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়, এর থেকে সালাম ফিরানো নেই এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর নেই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর সিজদা করতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। এতো ভিড় হতো যে, আমাদের মাঝে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১০৭

সিজদার ফযীলত সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে দূরে সরে যায় এবং বলতে থাকে, দুর্ভাগ্য আমার! আদম সন্তানকে সিজদার জন্য আদেশ করলে সে সিজদা করে জান্নাত লাভ করল। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হলেও আমি সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালাম; ফলে আমি জাহান্নামী হলাম। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৩

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘আল্লাহ আমাদের উপর (তিলাওয়াতের) সিজদাহ ফরয করেন নি। আমরা চাইলে তা করতে পারি।’ (বুখারী ১০৭৭নং)

যায়দ বিন সাবেত (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কাছে সূরা নাজম পাঠ করলাম। তিনি সিজদাহ করলেন না।’ (বুখারী ১০৭৩, মুসলিম, মিশকাত ১০২৬নং)

সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর দেয়ার বিধান রয়েছে। যেহেতু ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এই মর্মে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে।

তবে নামাযের মধ্যে তেলাওয়াতের সিজদা দেয়াকালে সিজদা দেয়া ও সিজদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর দেয়া আবশ্যক। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে প্রত্যেক ওঠানামার সময় তা করতেন। এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: “তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়।”[সহিহ বুখারী (৫৯৫)]

নামাযের সিজদাতে যে যে দোয়া পড়া শরিয়তসম্মত তেলাওয়াতের সিজদাতেও সে সে দোয়া পড়া শরিয়তসম্মত— এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর নির্দেশনার সার্বিকতার কারণে। এ ধরণের দোয়ার মধ্যে রয়েছে:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه، وَقُوَّتِهِ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সিজদাহ করেছি, আপনার ওপরই ঈমান এনেছি, আপনার কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দিয়েছেন, আর তার কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ সুমহান।) ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ হাদিসের সংকলনে (১২৯০) আলী (রাঃ) এর সূত্রে এ যিকিরটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের সিজদাতে এই যিকিরটি বলতেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাযের সিজদাতে যা যা বলা শরিয়তসম্মত তেলাওয়াতের সিজদাতেও তা তা বলা শরিয়তসম্মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তেলাওয়াতের সিজদাতে বলতেন:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا
مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! এই সিজদার বদৌলতে আপনার নিকট আমার জন্য একটি প্রতিদান লিখুন এবং এর দ্বারা আমার একটি গুনাহ মুছে দিন, এটাকে আমার জন্য আপনার কাছে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখুন। আর আমার পক্ষ থেকে এই সিজদাকে কবুল করে নিন; যেভাবে আপনার বান্দা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর থেকে কবুল করেছেন।)[সুনানে তিরমিযি (৫২৮)

এক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো নামাযের সিজদার মত: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলা। এর বেশি যা কিছু পড়া হয় সেটি মুস্তাহাব।

নামাযের ভেতরে কিংবা নামাযের বাইরে তেলাওয়াতের সিজদা দেয়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়। যেহেতু যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিসে এবং উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিসে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহই তাওফিক দেয়ার মালিক।

মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাক্বালাতি সামাহাতিশ শাইখ ইবনে বায (১১/৪০৬)

সিজদা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না -এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে। মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আর তারা নিজেরা স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এটা প্রমাণ করছে। [কুরতুবী]

--- তাদের ছায়াগুলো নত হওয়া ও সিজদা করার মানে হচ্ছে, ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে সিজদা করা। এ এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন। [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ বলেন, সিজদাকারীদের কেউ ইচ্ছাকৃত আল্লাহর সিজদা করে আবার কেউ করে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু তাদের ছায়াগুলো ঠিকই ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে। [বাগভী] মুজাহিদ বলেন, ঈমানদারের ছায়া ইচ্ছাকৃত সিজদা করে, আর সেও তা মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরের ছায়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে অথচ সে অপছন্দ করছে। [তাবারী] এ আয়াতের সমার্থে আরো এসেছে,

১৬ : ৪৮ اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ

“তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়? [সূরা আন-নাহলঃ ৪৮]

এখানে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত ও মর্যাদার উল্লেখ হচ্ছে যে, প্রত্যেক জিনিসই তাঁর সামনে অবনত-মস্তক। জড়পদার্থ হোক বা জীবজন্তু, জীন হোক বা মানুষ বা ফিরিশতা। প্রত্যেক ছায়াবিশিষ্ট বস্তু যখন তার ছায়া ডানে বামে ঢলে পড়ে, তখন সকাল-সন্ধ্যায় সে বস্তু নিজ ছায়ার সঙ্গে আল্লাহকে সিজদা করে। ইমাম মুজাহিদ বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে, তখন প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়।

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী(ﷺ) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবূ যার (রাঃ) কে বললেন, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যে পথে এসেছ, সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে--এটাই মর্ম হল আল্লাহ তাআলার বাণীঃ আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (ইয়াসীন : ৩৮) সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২৯৭২

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا ১৩ : ১৬
يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى
الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ
خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

১৬. বলুন, কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব? বলুন, আল্লাহ। বলুন, তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী

উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো। এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না। কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কারণ স্বীকৃতির পর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শির্কের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত বুনিয়াদ থাকতো না। তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ

প্রশ্নের জবাবে কিছু বলত না। এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, আপনি নিজে নিজেই বলুন আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো?

এখানেও আল্লাহ তাদের সেই স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ কথার স্বীকৃতি আদায় করছেন। কেননা, তারা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের রব হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন, এতদসত্বেও তারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক ইলাহ গ্রহণ করে সেগুলোর ইবাদাত করছে, অথচ ইলাহগুলো না নিজেদের কোন লাভ-ক্ষতির মালিক, না তাদের ইবাদতকারীদের। সেগুলো তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর তাদের কোন ক্ষতিও দূর করতে পারে না। তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে, যে আল্লাহর সাথে এ সমস্ত ইলাহের ইবাদাত করে, আর যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, আর সে তার রব প্রদত্ত স্পষ্ট আলোতে রয়েছে? [ইবন কাসীর]

---- এখানে তিনি ঈমানদার ও কাফেরের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না তেমনি কাফের ও ঈমানদার সমান হতে পারে না। [বাগভী] মুমিন হক প্রত্যক্ষ করে, পক্ষান্তরে মুশরিক হক দেখে না। [কুরতুবী] অথবা এখানে অন্ধ বলে তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইবাদাত করতো তাদেরকে বুঝানো হয়েছে আর চক্ষুষ্মান বলে স্বয়ং আল্লাহকেই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

----আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। এখানে উদ্দেশ্য ঈমান। [কুরতুবী] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো ঈমান লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে কুফরী। [কুরতুবী] কুফরীতে রয়েছে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আলো ও আঁধার কখনও সমান হতে পারে না। যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোচট খেয়ে ফিরতে থাকবে?

----এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্য মাখলুকরা সৃষ্টি করতো আর কোনটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোনটা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো।

কিন্তু ব্যাপারটি এ রকম নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] কারণ, তাঁর হুবহু যেমন কিছু নেই তেমনি তার মতও কিছু নেই। তার কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর অনুরূপ কেউ নেই, তার কোন মন্ত্রী-সাহায্যকারী নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, আর না আছে তাঁর কোন সঙ্গিনী। আল্লাহর মর্যাদা এ সমস্ত বিষয়াদি থেকে বহু উর্ধ্বে। এ মুশরিকরা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, এ সমস্ত মাবুদ যাদের ইবাদাত তারা করছে সেগুলো আল্লাহরই বান্দা, তাঁরই সৃষ্ট, যেমন তারা তাদের শির্কী তালবিয়াতে বলতঃ হাজির, তাঁর কোন শরীক নেই, তবে সে শরীক, যার কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে, আল্লাহর কর্তৃত্ব সে শরীকের কাছে নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। [সূরা আয-যুমার: ৩]

তারা যেহেতু এ ধরণের বিশ্বাস করে থাকে তাই আল্লাহ্ সেটা অস্বীকার করে বলেছেন যে, তার অনুমতি ব্যতীত কেউ নেই যে, সুপারিশ করবে। আর যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। [সূরা সাবাঃ ২৩] আরও বলেন, “আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে আসবে একাকী অবস্থায়। [সূরা মারইয়াম: ৯৩–৯৫] সুতরাং এসবই যখন বান্দা ও দাস, তখন বিনা দলীল-প্রমাণে শুধু মতের উপর নির্ভরশীল হয়ে একে অপরের ইবাদত কেন করবে? তারপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সবাইকে প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত সবাইকে এথেকে সাবধান করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করার জন্যই পাঠিয়েছেন। ফলে তারা তার রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করল এবং তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো, তাই তাদের উপর শাস্তির বাণী যথাযথ ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। “আর আপনার রব কারও উপর যুলুম করেন না” [সূরা আল-কাহাফঃ ৪৯] [ইবন কাসীর]

---- কেননা, কোন বস্তু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সৃষ্ট কোন কিছু স্রষ্টা ছাড়া এসেছে সেটাও অসম্ভব। তাতে বুঝা গেল যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিতে যার কোন শরীক থাকতে পারে না। কেননা, তিনি এক ও দাপুটে। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য একক ও মহাদাপুটে গুণ সাব্যস্ত করা যায় না। সৃষ্টিকুল এবং প্রতিটি সৃষ্টির উপরই কোন না কোন নিয়ন্ত্রণকারী দাপট দেখানোর মত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর তারও উপর রয়েছে আরেক নিয়ন্ত্রণকারী। কিন্তু তার উপর রয়েছেন সেই মহা দাপুটে সর্বনিয়ন্ত্রণকারী একক সত্তা। সুতরাং দাপট ও তাওহীদ একটি অপরটিকে বাধ্য করে। যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এভাবে বিবেকের শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান করে তাদের কেউই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আর এভাবেই তাদের ইবাদাত বাতিল প্রমাণিত হলো। [সা’দী]

----মূল আয়াতে ‘কাহ্‌হার’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার উপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্ত করে রাখেন। যার ইচ্ছার কাছে সমস্ত ইচ্ছাকারী হার মানে। [কুরতুবী] “আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা” একথাটি এমন সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। “তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী বা মহা দাপুটে” এটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবা্যৰ ফল। কারণ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে তিনি এক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি।

এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকার তথা ইবাদতে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করা এবং মহাপরাক্রমশালী সর্বনিয়ন্ত্রক আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান করা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ ২/৪৬৪—৪৬৫; মাদারিজুস সালেকীন ১/৪১৪]

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَ مِمَّا ১৭
يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ
الْبَاطِلَ ؕ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ
﴿كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧

১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে। এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন আলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু আগুন উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

بِقَدَرِهَا (বিস্তৃতি বা পরিমাণ অনুসারে) এর অর্থ নালা অর্থাৎ উপত্যকা (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান) সংকীর্ণ হলে অল্প, আর বিস্তৃত হলে অধিক পানি গ্রহণ করে। অর্থাৎ, পথের দিশারী ও জীবন-সংবিধান কুরআনের অবতীর্ণ হওয়াকে বৃষ্টি বর্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা কুরআনের উপকারিতাও বৃষ্টির উপকারিতার মত সার্বিক বা ব্যাপক। আর উপত্যকাকে তুলনা করেছেন হৃদয়ের সঙ্গে। কেননা উপত্যকায় পানি গিয়ে স্থির হয়ে যায়, যেমন কুরআন ও ঈমান মুমিনের হৃদয়ে স্থির হয়ে যায়।

নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চুলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আর্বজনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আবর্জনরাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

---- এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলত দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি পানির, অপরটি আগুনের। এ দুটি উদাহরণে আল্লাহ্ তা'আলা হক্ যে স্থায়ী এবং বাতিল যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

উদাহরণ দুটির মধ্যে প্রথমটি হল, আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন তখন উপত্যকাসমূহ তাদের নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। যদি উপত্যকাটি বড় হয়, তবে বেশী পানি ধারণ করে। আর যদি ছোট হয় তবে তার নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমন সব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য আছে।

একজনের মনে অনেক জ্ঞান ধারণ করে। আরেক জনের মন বেশী জ্ঞান ধারণ করতে পারে না।

অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হৈ-হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে। প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এগুলো মূলতঃ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির সমষ্টি। হকের সাথে এগুলোও মানুষের ওহীর পরিমাণ অনুসারে দ্রুত অথবা ধীরে ধীরে তারা তাদের ঈমানী জোরে সে সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তিকে দূরীভূত করে দিতে পারে। তখন শুধুমাত্র ঈমান বাকী থাকে। আর যা কুফর ও সন্দেহ সেগুলো অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, আগুণে পুড়ে খাটি হওয়ার উদাহরণ। সোনা, রূপা এবং এ জাতীয় ধাতব বস্তু যখনই পোড়ানো হয় তখন তার মধ্যস্থিত যাবতীয় ময়লা ও খাদ আলাদা হয়ে যায়। শুধু খাঁটি অংশই বাকী থাকে। তেমনিভাবে ঈমান যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন যৎসামান্য তাতে ময়লা-আবর্জনা সহ অবস্থান করতে থাকে। তারপর ঈমান ও দলীল-প্রমাণাদি পরপর তার কাছে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তার সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে সে খাঁটি হয়ে যায়। তার মনে আর কোন পংকিলতা স্থান পায় না।

এ দুটি উদাহরণের আরেকটি দিক হলো, আল্লাহর দরবারে যতক্ষণ কোন আমল খাঁটিভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হবে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থাকবে ততক্ষণ তা দূর করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। [ইবন কাসীর; অনুরূপ আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন ১/১১৭; ইগাসাতুল লাহফান: ১/২১; আল-আমসাল ফিল কুরআন ১১]

কথা বুঝাবার এবং মস্তিষ্কে বসাবার জন্য উদাহরণ পেশ করেন, যেমন এখানে দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন এবং অনুরূপ সূরা বাক্বারার প্রারম্ভে মুনাফিকদের জন্যে উদাহরণ পেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে--

এরাই তারা, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনেছে। কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্তও নয়।তাদের উপমা, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো; তারপর যখন আগুন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তখন তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, যাতে তারা কিছুই দেখতে পায়না।. তারা বধির, বোবা, অন্ধ, কাজেই তারা ফিরে আসবে না।সূরা বাকারাঃ১৬-১৮

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুনাফেকদের সম্পর্কে দুটো উপমা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর বলেন, দু'টি উপমা দু'ধরনের মুনাফিকদের জন্য দেয়া হয়েছে। প্রথম উপমার মর্মার্থ হলোঃ মুনাফেকরা হলো এমন ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকার কারণে অনেক কষ্টে আগুন জ্বলিয়েছে, যার আলোতে সে ভাল-মন্দ চিনতে পেরেছে। এবং আশা করছে যে, সে এ আলো তার জন্য স্থায়ী হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে সে আলো নিয়ে গেলেন। ফলে সে অন্ধকারে হিমশিম খেতে লাগল। যতটুকু আলো পেয়েছিল তাও চলে গেল, কিন্তু রয়ে গেল কষ্টদায়ক আগুন। এতে সে কয়েক ধরণের অন্ধকারে পতিত হলো- রাতের অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টির অন্ধকার ও আলোর পরে হঠাৎ করে সৃষ্ট অন্ধকার।

অনুরূপভাবে মুনাফেকদের অবস্থা হলো- তারা ঈমানদার থেকে ঈমানের আলো পেয়েছে। তাদের কাছে সে আলোর লেশমাত্রও ছিল না। তারপর যখন তারা সাময়িকভাবে এর দ্বারা আলোকিত ও উপকৃত হলো, পার্থিব জীবনে হত্যা থেকে নিষ্কৃতি পেল, সম্পদ রক্ষা পেল ও সাময়িক নিরাপত্তা লাভ করলো। ইত্যবসরে তাদের উপর মৃত্যু এসে পড়ল। ফলে তারা সে আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলো। তাদের উপর আপতিত হলো যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা ও শাস্তি। এতে করে সে কয়েক ধরনের অন্ধকারে পতিত হল- কবরের অন্ধকার, কুফরীর অন্ধকার, নিফাকের অন্ধকার, গোনাহর অন্ধকার সর্বোপরি জাহান্নামের অন্ধকার। যে অন্ধকার থেকে তার কোন মুক্তি নেই। [তাফসীর আস-সাদী]

অনুরূপ সূরা নূরের ৩৯-৪০নং আয়াতে কাফেরদের জন্য দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। আর হাদীসের মধ্যেও নবী (সাঃ) অনেক কথা উপমা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছেন।

“আর যারা কুফরী করে তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসা কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু যখন সে সেটার কাছে আসে তখন দেখে সেটা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্ যার জন্য নূর রাখেননি তার জন্য কোন নূরই নেই”। সূরা নূর ৩৯-৪০

দ্বিতীয় উপমা, তাদের আমল অন্ধকারের ন্যায়। অর্থাৎ, তাদের আমলগুলি মরীচিকার মত অথবা অন্ধকারের মত। অথবা আগের উপমা ছিল কাফেরদের আমলের। আর এটি তাদের কুফরের উপমা, যার মধ্যে একজন কাফের সারা জীবন নিমজ্জিত থাকে। কুফর, অবিশ্বাস, অস্বীকার, মিথ্যাজ্ঞান ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার, নিকৃষ্ট আমল ও শিরকী বিশ্বাসের অন্ধকার এবং প্রতিপালক ও তাঁর পরকালের আযাব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার অন্ধকার। এই সমস্ত অন্ধকার তাকে হিদায়াতের কোন পথই দেখতে দেয় না; যেমন অন্ধকারে মানুষ তার নিজের হাতও দেখতে পায় না।

অর্থাৎ পৃথিবীতে ঈমান ও ইসলামের আলো ভাগ্যে জোটে না। আর আখেরাতে ঈমানদাররা যে আলো পাবে, তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ১৩ : ১৮
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ
وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ؕ

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয় না, যমীনে যা কিছু আছে তার সবটুকুই যদি তারা মালিক হতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো কিছুও হতো তাহলেও তারা মুক্তিপণস্বরূপ তা দিত তাদেরই হিসেব হবে কঠোর। এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, আর সেটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

আয়াতটিতে আল্লাহ তা’আলা সৌভাগ্যশালী এবং দুর্ভাগাদের অবস্থা পরবর্তীতে কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে ঐ সমস্ত লোকগণ যারা তাদের প্রভুর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। রাসূলের কথা মেনেছে, তার যাবতীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের পরিণাম হবে ভাল। জান্নাত ও জান্নাতের যাবতীয় নে’আমত তারা পাবে। অপরদিকে ঐসমস্ত লোক যারা তাদের প্রভুর কথা

মানেনি। নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। তাদের উপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। কিন্তু তারা কোত্থেকেই তা দিবে? [দেখুন, সা’দী]

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। সূরা মুমিনঃ ৬০

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। সূরা বাকারাঃ ১৮৬

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ
ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ٢٤﴾ [الانفال: ٢٤]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৪]

--আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময়ের পরিমাণ জানিয়ে দিবেন এবং তারা যা কিছু ভুলে যাবে, তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এর নামই হিসাব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

‘সেদিন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যা তারা করতো। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন। আর তারা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালাহ: ৬) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا﴾
﴿مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

‘এবং তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তারা যাকিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি যুলুম করবেন না’’। (সূরা আল-কাহাফ: ৪৯) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

‘অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল: ৭-৮)

-- কঠোর বা নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। কুরআন থেকে আমরা আরো জানতে পারি, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে “সহজ হিসেব” অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ যখন “যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে” এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামের কাছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সহজ কর, কাছাকাছি হও, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন। [মুসলিমঃ ২৫৭৪]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছেঃ “যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে” এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা

আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে ধ্বংস হবে।” [বুখারীঃ ১০৩, মুসলিমঃ ২৮৭৬]

কিয়ামতের দিন যার হিসাব তলব করা হবে সেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি (আয়েশা) তখন বললাম, আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি: আর যার ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হবে তার হিসাব নেওয়া হবে সহজ ভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: এখানে আমলের হিসাব প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। যার হিসাবেই জওয়াব তলব করা হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে”।সহীহ বুখারী, ৬৫৩৭।

“তোমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি সেদিন আল্লাহ তা‘আলার সাথে সরাসরি কথা বলবে। কোনো দোভাষী বা মধ্যস্থ থাকবে না। মানুষ তখন তার ডান দিকে তাকাবে দেখতে পাবে শুধু তাদের প্রেরিত কর্ম। আর বাম দিকে তাকাবে দেখবে শুধু নিজ কৃত কর্ম। সামনের দিকে তাকাবে দেখবে শুধু জাহান্নামের আগুন। কাজেই তোমরা আগুন থেকে সাবধান হও নিজেদের বাঁচাও যদি একটি খেজুরের টুকরা দান করার বিনিময়েও হয়”।সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫১২।

নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না।

কুরআন আমাদের জানায়, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে “সহজ হিসেব” অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক কর্মনীতির সুকৃতিকে সামনে রেখে বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আবু দাউদে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে ভয়াবহ আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতটি যাতে বলা হয়েছেঃ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجزبه অর্থাৎ “যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে।” একথায় নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো না, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাহলে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন? আখেরাতে তো যারই হিসেব শুরু হবে সে অবশ্যি শাস্তি পাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন তাহলে আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছে-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

“যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে।”

এর জবাবে নবী ﷺ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলো উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে মারা পড়েছে।